ইউনিট- ২০

মানব জীবনে উদ্ভিদের গুরুত্ব

ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। বিবেক, বুদ্ধি, বিদ্যা, কথা বলার ক্ষমতা এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ। বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ দূরকে এনেছে অতি কাছে, জয় করেছে দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার, এমনকি পৌঁছে গেছে গ্রহান্তরে চাঁদের দেশে, মঙ্গল গ্রহে, কিন্তু মানুষ আজ পর্যন্ত নিজের জন্যে এক গ্রাস খাদ্যও নিজে তৈরি করতে পারেনি। অক্সিজেন ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচার ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। এদিক থেকে বিবেচনা করলে মানুষ একটি অতি ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ার সমতুল্যও হতে পারেনি। মানুষ সত্যিই অসহায়, তাকে নির্ভর করতে হয় অন্যের উপর, উদ্ভিদের উপর। সৃষ্টির আদি কালে বায়ুমন্ডলে কোন অক্সিজেন ছিল না। বায়ুমন্ডলের এ অক্সিজেন সৃষ্টি করেছে ক্ষুদ্রাকায় উদ্ভিদ, যার জন্য আজ মানুষসহ অসংখ্য জীব তাদের জীবন চক্র অব্যাহত রাখতে পেরেছে। কাজেই মানুষ তার খাদ্যের জন্য, বস্ত্রের জন্য, বাসস্থানের জন্য, ওষুধ ও পথ্যের জন্য, জ্বালানীর জন্য, বিলাসবহুল আরামপ্রদ জীবনের জন্য, বুকভরে শ্বাস নেয়ার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এক কথায় বলা যায় মানুষের জীবনে উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম।

সব উদ্ভিদের ব্যবহার আমরা জানিনা, জানিনা এদের অন্তর্নিহিত গুনাবলী। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টায় ও উন্নত প্রযুক্তির গবেষণায় ক্রমেই এদের নতুন নতুন অজানা গুনাবলী আমাদের কাছে উন্মোচিত হচ্ছে। কাজেই মানব জীবনে উদ্ভিদের গুরুত্ব সম্বন্ধেও আমাদেরকে জানতে হবে ভালভাবে। উদ্ভিদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে, ততই সফলভাবে এদেরকে আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে পারবো। বিভিন্ন উদ্ভিদের গুনাবলী ও সঠিক ব্যবহার জানার জন্যই এই ইউনিটের অবতারনা। অসংখ্য উদ্ভিদের অফুরন্ত ব্যবহার এই ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়, তাই কিছু নির্বাচিত বিষয়কে এই ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়গুলোকে ছয়টি পাঠে বিন্যস্ত করা হলো।

পাঠ- ১ ঃ খাদ্যশস্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- খাদ্যশস্য ও খাদ্যদানা কি তা বলতে পারবেন।
- ইরি (IRRI) এবং বিরি (BRRI) বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- খাদ্য ও খাদ্যশস্যের পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখতে পারবেন।
- চাল, ময়দা এবং আটার মধ্যে কোনটির পুষ্টিমান ভাল তা নির্দেশ করতে পারবেন।

বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত। অধিকাংশ পশ্চিমা দেশে প্রধান খাদ্য আটা, কোথাও কোথাও আলু, আবার আফ্রিকার কোন কোন দেশে কলা। সহজ কথায় যা খাবার যোগ্য তাই খাদ্য। সব খাদ্যই কিন্তু খাদ্য শস্য থেকে আসে না। Poaceae (=Gramineae) গোত্রের খাদ্যদানা উৎপাদনকারি উদ্ভিদ গুলোকে বলা হয় খাদ্য শস্য (cereals), যেমন- ধান, গম, ভুট্টা, বার্লি, জোয়ার, কাউন, চিনা, বাজরা ইত্যাদি। খাদ্যশস্যের ফলকে বলা বলা হয় খাদ্যদানা (grain)। খেজুর একটি ভাল খাদ্য হলেও খাদ্যশস্য নয়। মিষ্টি আলু, আলু, কলা এ গুলোও খাদ্য, কিন্তু খাদ্যশস্য নয়, কারন এর কোনটিই Poaceac গোত্রের উদ্ভিদ নয়। সহজভাবে বলা যায়, খাদ্যদানা উৎপাদনকারি শস্যই খাদ্যশস্য। নিচে কতিপয় উল্লেখযোগ্য খাদ্যশস্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

১। ধান (Paddy) ঃ আমাদের দেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন খাদ্যশস্য হলো ধান। ধানের বৈজ্ঞানিক নাম *Oryza sativa* L. গোত্র Poaceae (=Gramineae). পৃথিবীতে ধানের কয়েক হাজার প্রকরন আছে। আমাদের দেশেও অনেক ধরনের ধান আছে। ধানের চাল সরু, মোটা, সুগন্ধযুক্ত, অথবা গন্ধহীন হতে পারে। এদের স্বাদের মধ্যেও বেশ পার্থক্য রয়েছে। যাই হোক সব ধরনের ধানকে আমরা আউস, আমন ও বোরো এই তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি। আমাদের দেশে এই তিন ধরনের ধানই আবাদ করা হয়ে থাকে।

আউস ঃ যে জমিতে সাধারণত পানি জমা হয়ে থাকে না, তেমন জমিতে আউস ধানের চাষ ভাল হয়। পলিমাটি, দো-আঁশ মাটি এবং এঁটেল মাটিতে আউস ধান ভাল জন্মায়।

এপ্রিল-মে মাসে জমিতে ধানের বীজ সারি করে বা ছিটিয়ে বপন করতে হয়। ধান পাকতে ৩/৪ মাস সময় লাগে। সাধারনত: আগস্ট মাসে আউস ধান কাটা হয়।

আমন ঃ যে জমিতে পানি জমা হয়ে থাকে সেই জমিতে আমন ধানের চাষ ভাল হয়। পলি দো-আঁশ মাটিতে আমন ধান সবচেয়ে ভাল জন্মে।

জুলাই মাসের শেষ দিকে বা আগস্ট মাসের প্রথম দিকে বীজতলা থেকে চারা এনে জমিতে সারি করে লাগনো হয়। সারিতে এক ফুট দূরে দূরে ৩/৪টি করে চারা লাগাতে হয়। সাধারণত: ডিসেম্বর মাসে ধান কাটা হয়।

বোরো ঃ বোরো ধান সাধারণত: নিচু জমিতে, বিশেষ করে হাওর, বিল প্রভৃতি নিচু এলাকায় চাষ করা হয়। জমিতে পানি না থাকলে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। বোরো ধান প্রধানত: দু'প্রকার i) রবি বোরো এবং ii) খারিফ বোরো।

i) রবি বোরো ঃ আমাদের দেশে রবি বোরোর চাষই বেশি হয়। হাওড়-বাওড় বিল এলাকায় রবি বোরোর চাষ হয়। ডিসেম্বর মাসে বীজ তলায় বীজ বুনতে হয় এবং জানুয়ারী মাসে বীজতলা থেকে চারা এনে জমিতে লাগাতে হয়। এপ্রিল-মে মাসে রবি বোরো কাটা হয়।

ii) খারিফ বোরো ঃ খারিফ বোরো ধানের বীজ জুন-জুলাই মাসে বীজতলায় ছিটাতে হয় এবং জমিতে জুলাই আগস্ট মাসে চারা লাগানো হয়। এ বোরো সেপ্টেম্বর-আক্টোবর মাসে কাটা হয়।

ইরি ধান, বিরি ধান ঃ ফিলিপাইনের Los Banõs এ অবস্থিত International Rice Research Institute কে সংক্ষেপে বলা বলা হয় IRRI বা ইরি। এই প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধানগুলোকে বলা হয় ইরিধান। IR-5, IR-8, IR- 29, IR- 35, ইত্যাদি কয়েকটি ইরি ধানের উদাহরণ। ইরি ধান আউস, আমন, বোরো এই তিন রকমই আছে। ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে অবস্থিত Bangladesh Rice Research Institute কে বলা হয় BRRI বা বিরি। এই প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধানকে বলা হয় বিরি ধান। এখান থেকে ইরিশাইল, বিরিশাইল, মালা, চান্দিনা প্রভৃতি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ধান থেকে উৎপাদিত দ্রব্য ঃ চাল

ব্যবহার ঃ চাল থেকে রান্না করে পাই ভাত। ভাত পৃথিবীর প্রায় ৬৫ ভাগ লোকের প্রধান খাদ্য। চিড়া, মুড়ি, খই, পিঠা, পায়েশ ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য চাল থেকে তৈরি করা হয়।

২। গম (Wheat) ঃ গম আমাদের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য। ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশের লোকদের প্রধান খাদ্য আটা, যা গম থেকে পাওয়া যায়। গমের বৈজ্ঞানিক নাম *Triticum aestivum*, গোত্র Poaceae; গম প্রধানত: দু'প্রকার। যথা- শীতকালীন গম, যা শীতকালে চাষ করা হয় এবং বসন্তকালীন গম যা বসন্তকালে চাষ করা হয়। আমাদের দেশে শীত প্রধান দেশের বসন্তকালীন গম চাষ করা হয় শীতকালে।

উৎপাদিত দ্রব্য ঃ আটা, ময়দা, সুজি,

ব্যবহার ঃ রুটি, পাউরুটি, হালুয়া, বিস্কুট, পিঠা ইত্যাদি।

৩। ভুট্টা (Maize) ঃ বাংলাদেশে ধান ও গমের তুলনায় ভুট্টার চাষ বেশ কম, তবে এর চাষ ক্রমেই বাড়ছে। ভুট্টার বৈজ্ঞানিক নাম *Zea mays* গোত্র Poaceae। ভূট্টা গাছ অনেকটা আখের মত, বর্ষজীবি, শীতকালে চাষ করা হয়। মার্চ এপ্রিল মাসে ফসল কাটা হয়।

ব্যবহার ঃ ভূট্টা হতে হরেক রকমের খাবার তৈরি করা হয়। ঢাকার বাজারে ভুট্টার কর পুড়িয়ে খাওয়া হয়, এটি রাস্তার পাশের একটি জনপ্রিয় খাবার-এ পরিনত হচ্ছে।

এছাড়া আমাদের দেশে অল্প পরিমানে বালি *(Hordeum vulgare),* জোয়ার *(Sorghum vulgare),* কাউন *(Setaria italica),* চিনা *(Panicum miliaceum),* বাজরা *(Pennisetum typhoideum)* প্রভৃতি খাদ্যশস্যও চাষ করা হয়।

খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান ঃ যে কোন খাদ্যের মান নির্ভর করে তার পুষ্টিমানের উপর। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাদ গন্ধের উপরও মান নির্ভর করে। আমরা চাল, আটা, ময়দা এ গুলো প্রায় প্রতিদিন ব্যবহার করি। এদের পুষ্টি মান কিন্তু সমান নয়। একটি ছকের মাধ্যমে এদের পুষ্টিমানের তুলনা করা হলো (প্রতি ১০০ গ্রামে)

চাল, আটা ও ময়দার পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

নাম	শর্করা (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	ক্যারোটিন (মাইক্রোগ্রাম)	ভিটামিন-বি^{১} (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন- বি^{২} (মিলিগ্রাম)
চাল (সিদ্ধ, ঢেকিছাঁটা)	৭৭.৪	৮.৫	০.৬	১০.০	২.৮	৯.০	০.২৭	০.১২
আটা	৬৯.৪	১২.১	১.৭	৪৮.০	১১.৫	২৯.০	০.৪৯	০.২৯
ময়দা	৭৩.৯	১১.০	০.৯	২৩.০	২.৫	২৫.০	০.১২	০.০৭

সূত্রঃ

এ ছক থেকে বুঝা যায় আটার পুষ্টিমান চাল এবং ময়দা অপেক্ষা উন্নত।

সারসংক্ষেপ

- Poaceae গোত্রের খাদ্যদানা উৎপাদনকারি উদ্ভিদগুলোকে বলা হয় খাদ্যশস্য। ধান, গম, ভুট্টা, বার্লি, জোয়ার, কাউন, চিনা, বাজরা ইত্যাদি খাদ্যশস্য।
- খাদ্যশস্যের ফলকে বলা হয় খাদ্য দানা।
- বাংলাদেশের জয়দেবপুরে অবস্থিত "Bangladesh Rice Research Institute" কে সংক্ষেপে বলা হয় BRRI (বিরি)।
- ফিলিপাইনের Los Banõs এ অবস্থিত International Rice Research Institute কে সংক্ষেপে বলা হয় IRRI (ইরি)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

১। ধান কেন একটি খাদ্যশস্য?
ক. এটি আমাদের প্রধান খাদ্য
খ. এটি আমাদের প্রধান ফসল
গ. কম খরচে উৎপন্ন হয়
ঘ. এটি poaceae গোত্রের দানা প্রদানকারি উদ্ভিদ

২। ধানের বৈজ্ঞানিক নাম কি?
ক. *Oryza sativa*
খ. *Triticum aestivum*
গ. *Hordeum vulgare*
ঘ. *Panicum miliaceum*

৩। খেজুর কেন খাদ্যশস্য নয়?
ক. এটি বৃক্ষ থেকে পাই
খ. এর খাদ্যমান ভাল নয়
গ. এটি খাদ্য দানা প্রদানকারি উদ্ভিদ নয়
ঘ. বাংলাদেশে এর চাষ বেশি হয় না

৪। 'ইরি' কোথায় অবস্থিত?
ক. বাংলাদেশে
খ. ভারতে
গ. ফিলিপাইনে
ঘ. ইরানে

৫। খাদ্যশস্য প্রদানকারি উদ্ভিদ গোত্র কোনটি?
ক. Punicaceae
খ. Poaceae
গ. Proteaceae
ঘ. Polygonaceae

পাঠ- ২ ঃ ডাল ও তৈলবীজ

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- খাদ্য তালিকায় ডালের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডাল প্রদানকারি কিছু উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখতে পারবেন।
- ল্যাথাইরিজম কি এবং কেন হয় তা বলতে পারবেন।
- ভেজিটেবল অয়েল কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- উদ্বায়ী ও স্থায়ী তেলের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- তেল প্রদানকারি উদ্ভিদ সমূহের নাম লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার তেলের ব্যবহার বলতে পারবেন।
- শীতকালে নারিকেল তেল জমাট বেঁধে যায় কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ডাল (Pulses)

ডাল আমিষ জাতীয় খাদ্য। আমিষের পরিমানে মাছ ও মাংসের সাথে ডাল তুলনীয়। তাই অনেক সময় ডালকে গরীবের মাংস বলা হয়। আমিষ ছাড়াও ডালে উল্লেখযোগ্য পরিমান শর্করা, বিভিন্ন খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিন থাকে।

সব ডাল প্রদানকারি উদ্ভিদই Fabaceae গোত্রের Papilionaceae উপ-গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। Rhizobium গণের একাধিক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া ডাল জাতীয় উদ্ভিদের মূলে সিমবায়োটিক প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডলস্থ মুক্ত নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে, ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে শীতকালেই ডালের চাষ হয়ে থাকে। নিচে কতিপয় উল্লেখযোগ্য ডালের বৈজ্ঞানিক নাম, আমিষ ও শর্করার পরিমান এবং ব্যবহার দেয়া হলো।

১। মসুর ঃ এর বৈজ্ঞানিক নাম *Lens culinaris Medik (L. esculenta Moench)*। মসুর ডালে আমিষের পরিমান শতকরা ২৭ ভাগ এবং শর্করার পরিমান ৫৫ ভাগ।

ব্যবহার ঃ ডাল হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। চালের গুঁড়ার সাথে মিশিয়ে পিঠা তৈরি করা হয়। মসুর এর খড়, তুষ প্রভৃতি ছাগল, গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২। ছোলা ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Cicer arietinum* L. চানা বা বুট নামেও এটি পরিচিত। এতে আমিষ শতকরা ২১ভাগ এবং শর্করা ৫৪ ভাগ থাকে।

ব্যবহার ঃ ছোলা ভিজিয়ে প্রতিদিন সকালে খেলে কখনও হৃদরোগ হয় না বলে কথিত আছে। ছোলা ভাজাও একটি উপাদেয় খাদ্য। ডাল হিসেবেও ছোলা খাওয়া হয়। ছোলার ময়দা বা বেশন হতে পিঠা ও অন্যান্য খাবার জিনিস তৈরি করা হয়। এর খড়, ভূষি গরু-ছাগলের উত্তম খাদ্য।

৩। খেসারী ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Lathyrus sativus* L. নদীর চরাঞ্চলে এর অধিক চাষ হয়ে থাকে। খেসারী ডালে শতকরা ২৮-৩০ ভাগ আমিষ এবং ৪৬ ভাগ শর্করা আছে। ডালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমান আমিষ আছে খেসারী ডালে, তবুও এটি নিম্নমানের ডাল হিসেবে পরিচিত।

ব্যবহার ঃ ডাল হিসেবেই এটি ব্যবহৃত হয়। অধিক দিন একটানা খেসারীর ডাল খেলে পা অবশ হয়ে যায় (প্যারালাইসিস হয়), যাকে ল্যাথাইরিজম বলা হয়। খেসারী ডালে BOAA নামক বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয়, যার ক্রিয়ায় ল্যাথাইরিজম হয়। ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি ফেলে দিয়ে রান্না করলে ল্যাথাইরিজম হয় না, কারণ BOAA অ্যামিনো অ্যাসিড পানিতে দ্রবিভূত হয়ে চলে যায়। এর খড়, ভূষি গরু-ছাগলের ভাল খাদ্য।

৪। সোনামুগ ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Vigna radiata* (L.) Wilezk.। বীজ সোনালী। ডালে আমিষ শতকরা ২৬ ভাগ এবং শর্করা ৫১ ভাগ।

ব্যবহার ঃ ডাল হিসেবেই অধিক ব্যবহৃত হয়। খড় ও ভূষি গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৫। মাস কলাই ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Vigna mungo* L. এর বীজ কালো। এর বেশ কিছু প্রকরণ আছে এবং প্রকরণ অনুযায়ী বীজ ছোট-বড় হতে পারে। ডালে শতকরা ২৫ ভাগ আমিষ এবং ৫৬ ভাগ শর্করা আছে।

ব্যবহার ঃ ডাল হিসেবেই এর প্রধান ব্যবহার। জিলাপী, পিঠা ও অন্যান্য খাদ্য তৈরিতেও এই ডাল ব্যবহার করা হয়। খড়, ভূষি গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া মটর (*Pisum sativum*), শিম (*Lablab purpureus*), অড়হর (*Cajanus cajan*) এবং সয়াবিন (*Glycine max*) ইত্যাদি ডাল হিসেবে খাওয়া হয়। এদের মধ্যে শিম বড় লতানো গাছ এবং অড়হর উঁচু কাষ্ঠল বীরুৎ, অন্যান্য সব ডালই ছোট বীরুৎ। সয়াবিন সাধারণত তেল আহরনের জন্যই ব্যবহার করা হয়।

তৈলবীজ (Oil seeds)

যে সব বীজে আহরণ যোগ্য তেল সঞ্চিত থাকে তারা তৈল বীজ হিসেবে পরিচিত। তিল, সরিষা, বাদাম, সয়াবিন ইত্যাদি উদ্ভিদের বীজে আহরণ যোগ্য তেল জমা থাকে। উদ্ভিদের বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে তেল তৈরি হয় এবং বীজে তা খাদ্য বা উপজাত পদার্থ হিসেবে জমা থাকে। উদ্ভিদাংগ হতে যে তেল পাওয়া যায় তাই উদ্ভিজ্জ তেল বা ভেজিটেবল অয়েল হিসেবে পরিচিত। তেল হলো গ্লিসারোল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এটি প্রকোষ্ঠ উষ্ণতায় তরল অবস্থায় বিরাজ করলে তেল বলা হয়; আর জমাট বাঁধা অবস্থায় বিরাজ করলে চর্বি বলা হয়।
নিচে আমাদের দেশে অধিক ব্যবহৃত তেলবীজ প্রদানকারি উদ্ভিদ সমূহের বৈজ্ঞানিক নাম, বীজে তেলের পরিমান ও ব্যবহার দেয়া হলো।

১। সয়াবীন ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Glycine max* (গোত্র : Fabaceae)। বাংলাদেশে সয়াবীনের চাষ এখনও ব্যাপকভাবে শুরু হয় নাই। দেশে ব্যবহার্য বেশিরভাগ তেলই বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। পেষণ প্রক্রিয়ায় বীজ হতে তেল নিষ্কাশন করা হয়। বীজে তেলের পরিমান ১৫-২৫ ভাগ।

ব্যবহার ঃ প্রধান ব্যবহার ভোজ্য তেল হিসেবে। কৃত্রিম ঘি ও মাখন তৈরিতেও ব্যবহার করা হয়। সাবান তৈরি, বার্নিশ প্রভৃতি কাজেও সয়াবীন তেল ব্যবহার করা হয়।

২। সরিষা ঃ বাংলাদেশে সাধারনত: টরি সরিষা এবং রাই সরিষার চাষ বেশি হয়ে থাকে। টরি সরিষার বৈজ্ঞানিক নাম *Brassica juncea* এবং রাই সরিষার বৈজ্ঞানিক নাম *Brassica napus*। সরিষা Brassicaceae গোত্রের উদ্ভিদ। সরিষা বীজে তেলের পরিমান ৩০-৪৫ ভাগ। পেষন প্রক্রিয়ায় তেল নিষ্কাশন করা হয়।

ব্যবহার ঃ ভোজ্য তেল হিসেবেই বেশি ব্যবহার করা হয়। ছেলে মেয়েদের গায়ে মাখার তেল হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। জ্বালানী হিসেবে এবং রাবার শিল্পেও এর ব্যবহার আছে।

৩। তিল ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Sesamum indicum*, গোত্র - Pedaliaceae). বীজে তেলের পরিমান ৪৫-৫৫ ভাগ। বীজ হতে পেষণ প্রক্রিয়ায় তেল নিষ্কাশন করা হয়।

ব্যবহার ঃ অলিভ অয়েলের পরিবর্তে তিল তেল ব্যবহার করা চলে। রান্নার কাজে, সাবান তৈরিতে, ওষুধ তৈরিতে, রং এর কাজেও ব্যবহার করা হয়। পিঠা, বিস্কুট, ও এ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি তৈরিতে তিল বীজ ব্যবহার করা হয়। মাথায় মাখার জন্যও তিল তেল ভাল।

৪। চীনাবাদাম ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Arachis hypogaea* (গোত্র- Fabaceae). চিনাবাদামের ফুল হয় মাটির উপর কিন্তু ফল সৃষ্টি হয় মাটির নিচে। পরাগায়নের পর ফুলের বোঁটা ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়ে ফুলের গর্ভাশয়সহ মাটির নিচে চলে যায় এবং মাটির নিচেই ফলের বৃদ্ধিও পরিপক্কতা ঘটে। কাজেই বেলে মাটিতে চিনাবাদাম উৎপাদন সবচেয়ে ভাল হয়। বীজে তেলের পরিমান ৪০-৫০ ভাগ। পেষন প্রক্রিয়ায় তেল নিষ্কাশন করা হয়।

ব্যবহার ঃ চীনাবাদাম তেল রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। উল্লেখযোগ্য পরিমান তেল হাইড্রোজিনেশনের মাধ্যমে কৃত্রিম ঘি ও মাখন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। চিনাবাদাম ভেজেও খাওয়া হয়।

৫। নারিকেল ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Cocos nucifera* (গোত্র- Arecaceae). এটি শাখাবিহীন বৃক্ষজাতীয় একবীজপত্রী উদ্ভিদ। বীজের শাঁস (কোপ্রা) হতে তেল নিষ্কাশন করা হয়। শাঁসে তেলের পরিমান ৬৫-৭০ ভাগ।

ব্যবহার ঃ আমাদের দেশে মাথায় মাখার তেল হিসেবেই নারিকেল তেল অধিক ব্যবহৃত হয়। রান্নার কাজেও নারিকেল তেল ব্যবহার করা চলে। নারিকেল তেলের এক বড় অংশ কৃত্রিম মাখন ও ঘি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। খুলনা, বরিশাল,

নোয়াখালী প্রভৃতি উপকূলীয় জেলায় নারিকেলের কোপ্রাকে তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ভাল টয়লেট সাবান, ক্রীম, শ্যাম্পু প্রভৃতি তৈরিতেও নারিকেল তেল ব্যবহার করা হয়।

ফ্যাটি অ্যাসিড অসম্পৃক্ত (Unsaturated) এবং সম্পৃক্ত (saturated) দু'রকম আছে। নারিকেল তেল গঠনকারি অধিকাংশ ফ্যাটি অ্যাসিড সম্পৃক্ত, তাই শীতকালে নারিকেল তেল জমাট বেঁধে যায়।

এছাড়াও তেলবীজ প্রদানকারি নিম্নলিখিত উদ্ভিদ আমাদের দেশে চাষ করা হয়।

তিসি ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Linum usitatissimum* (গোত্র- Linaceae)। বীজে তেলের পরিমান ৩২-৪৩ ভাগ। রান্নার কাজে, ছাপার কালি তৈরিতে, রং ও বার্নিশের কাজে ব্যবহার করা হয়।

গোজী বা কালোতিল ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Guizotica abyssinica*, (গোত্র- Asteraceae)। বীজে তেলের পরিমাণ ৩০-৫০ ভাগ। রান্নার কাজে, রং এর কাজে এবং সাবান তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

কুসুমফুল ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Carthamus tinctorius* (গোত্র- Asterauae)। বীজে তেলের পরিমান ২০-২৮ ভাগ রং, বার্নিশ, সাবান তৈরি, জ্বালানী এবং রান্নার কাজে এই তেল ব্যবহার করা হয়।

সূর্যমুখী ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Helianthus annuus* (গোত্র- Asteraceae). আমাদের দেশে প্রধানত: ফুলের জন্য চাষ করা হতো, বর্তমানে তেলের জন্যও চাষ করা হয়। বীজে তেলের পরিমান ২৫-৩৫ ভাগ। রান্নার কাজে, সাবান তৈরিতে রং এবং বার্নিশের কাজে ব্যবহার করা হয়।

তুলা ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Gossypium herbaceum* (গোত্র- Malvaceae) কার্পাস তুলা চাষ করা হয় তুলার আঁশের জন্য, তবে এর বীজে প্রচুর পরিমান তেল আছে। বীজে তেলের পরিমান ১৮-২৪ ভাগ। ভোজ্য তেল হিসেবে এবং কৃত্রিম ঘি তৈরি করতে এই তেল ব্যবহার করা হয়।

রেড়ি *(Ricinus communis),* মহূয়া *(Madhuca indica),* বাজনা *(Zanthoxylum budranga),* পিতরাজ বা রউন্যা (Amoora rohituca) ইত্যাদি উদ্ভিদের বীজ থেকেও তেল আহরণ করা হয়। এর মধ্যে উপরে উল্লিখিত উদ্ভিদসমূহের মধ্যে কেবল মাত্র নারিকেলই একবীজপত্রী উদ্ভিদ, অন্যান্য সবই দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ।

এছাড়াও অন্য এক ধরনের তেল আছে যাকে বলা হয় উদ্বায়ী তেল (volatile oil or essential oil)। এরা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বাতাসের সংস্পর্শে আসলে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বাতাসে মিশে যায়। উদ্বায়ী তেল সাধারণত: পাতায়, ফুলের মুকুল বা পাপড়িতে, ফলের খোসায় বিভিন্ন গ্রন্থিতে বিরাজ করে। আতর, বেলী সুগন্ধি, অরেঞ্জ তেল, লবঙ্গ তেল, ইউকেলিপটাস তেল ইত্যাদি উদ্বায়ী তেলের উদাহরণ।

সারসংক্ষেপ

- ডাল আমিষ জাতীয় খাদ্য। সব ডালই Fabaceae গোত্রের Papilionaceae উপগোত্রের অন্তর্ভুক্ত। Rhizobium ব্যাক্টেরিয়া ডালজাতীয় উদ্ভিদের মূলে সিমবায়োটিক প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডলস্থ মুক্ত নাইট্রোজেন সংরক্ষন করতে পারে।
- অনেকদিন একটানা খেসারী ডাল খেলে 'ল্যাথাইরিজম' নামক পায়ের প্যারালাইসিস রোগ হতে পারে।
- উদ্ভিদ থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাকে বলা হয় "ভেজিটেবল অয়েল" বা উদ্ভিজ্জতেল। তেলে গ্লিসেরল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে।
- খাবার তেল হিসেবে সরিষার তেলের চেয়ে সয়াবিন তেল উত্তম। তার থেকেও ভাল সূর্যমুখীর তেল এবং ভূট্টাবীজের তেল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

১। ডাল কোন জাতীয় খাদ্য?

ক. আমিষ　　খ. শর্করা

গ. চর্বি　　ঘ. খনিজ

২। কোন ঋতুতে আমাদের দেশে ডালের চাষ হয়?
ক. গ্রীষ্ম খ. বসন্ত
গ. শীত ঘ. বর্ষা

৩। ডালকে গরীবের মাংস বলা হয় কেন?
ক. ডালের স্বাদ মাংসের মত খ. ডালের মূল্য মাংসের সমান
গ. ডালের প্রোটিনের পরিমান মাংসের সাথে তুলনীয় ঘ. মাংস না পেয়ে গরীবরা ডাল খায়

৪। মসুর ডালের বৈজ্ঞানিক নাম কি?
ক. *Lens culinaris* খ. *Cicer arietinum*
গ. *Lathyrus sativus* ঘ. *Pisum sativum*

৫। তিল উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম কি?
ক. *Brassica napus* খ. *Sesamum indicum*
গ. *Glycine max* ঘ. *Helianthus annuus*

৬। কোন উদ্ভিদের বীজে কোপ্রা পাওয়া যায়?
ক. নারিকেল খ. সরিষা
গ. সয়াবীন ঘ. তিল

৭। একবীজপত্রী তৈলবীজ কোনটি?
ক. সরিষা খ. তিল
গ. তিসি ঘ. নারিকেল

৮। কোনটি বীরুৎ নয়?
ক. নারিকেল খ. সরিষা
গ. চিনাবাদাম ঘ. তিসি

পাঠ- ৩ ঃ সবজি, ফল ও পানীয়

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- সবজি কি তা বলতে পারবেন।
- শাক-সবজি ও সালাদের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- সবজির উপকারিতা বলতে পারবেন।
- প্রধান প্রধান সবজির বৈজ্ঞানিক নাম লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ফলের বৈজ্ঞানিক নাম লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশের জাতীয় ফলের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- পানীয় বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কেমন জায়গায় চা-এর উৎপাদন ভাল হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোথা থেকে চা ও কফি পাই তা বলতে পারবেন।

সবজি (Vegetable)

শাক-সবজি আমাদের খাদ্য তালিকার নিত্যদিনের উপাদান। শাক-সবজিতে শর্করা, আমিষ, বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ লবন থাকে। তাই নিয়মিত শাক-সবজি খেলে কোষ্ঠ কাঠিণ্য হয় না, উদর পরিষ্কার ও শরীর গঠিত হয়।

উদ্ভিদের মূল, কান্ড, ফুল ও ফল যা রান্না করে তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়, তাই সবজি হিসেবে পরিচিত। উদ্ভিদের পাতা, কচি ডগা রান্না করে খাওয়া হলে তা শাক হিসেবে চিহ্নিত হয়। মূলা সবজি হিসেবে কিন্তু -এর কচি পাতা শাক হিসেবে খাওয়া হয়, লাউ সবজি হিসেবে এবং লাউ-এর ডগা শাক হিসেবে খাওয়া হয়। সাধারণ ভাবে শাক-সবজি প্রায় সম অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাজা শাক-সবজি যখন রান্না না করে কাঁচা খাওয়া হয় (অনেক সময় তেল, শির্কা, মসলা সহযোগে) তখন তাকে সালাদ বলা হয়। পুদিনা পাতা, লেটুস পাতা, শসা, ক্ষিরা, টমেটো এ গুলো সালাদ হিসেবে খাওয়া হয়।
নিচে কয়েকটি সবজির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো।

মূল সবজি ঃ এদের মূল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।

১। মূলা ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Raphanus sativus;* গোত্র- Brassicaceae এর সঞ্চয়ী প্রধান মূল সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২। শালগম ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Brassica campestris* vas. *turnip;* গোত্র- Brassicaceae. এর সঞ্চয়ী প্রধান মূল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।

৩। গাজর ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Daucas carota,* গোত্র- *Ammiaceae* এর সঞ্চয়ী প্রধান মূল সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কান্ড সবজি ঃ এদের কান্ড সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১। ডাঁটা ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Amaranthus gangeticus,* গোত্র- Amaranthaceae।

২। আলু ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Solanum tuberosum,* গোত্র- Solanaceae। আলু ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত কান্ড। আলু সারা বছর পাওয়ার মত একটি সবজি।

৩। কচু, মানকচু, ওল কচু এদের কান্ডও সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরা Araceae গোত্রের উদ্ভিদ। সব কচুর ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত কান্ড আছে। এদের বৈজ্ঞানিক নাম যথাক্রমে *Colocasia esculenta, Alocasia indica* এবং *Amorphophallus campanulatus*।

পাতা সবজি ঃ এদের পাতা সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।

১। বাঁধা কপি ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Brassica oleracea* vas. *capitata,* গোত্র- Brassicaceae এর পাতাগুলো কুন্ডলিত অবস্থায় থাকে।

ফুলসবজি ঃ ফুল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।

১। ফুলকপি ঃ ফুল কপির বৈজ্ঞানিক নাম *Brassica oleracea* vas. *botrytis*, গোত্র- Brassicaceae এর অপ্রস্ফুটিত পুষ্প বিন্যাস সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।

ফলসবজি ঃ এদের ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। আমাদের অধিকাংশ সবজিই ফল সবজি; যেমন- বেগুন, টমেটো, কাঁচকলা, ঢেঁড়স (ভিনডি), পেঁপে, শিম, বরবটি, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, লাউ, শসা, পটল, চিচিঙ্গা, ঝিংগা, ধুনদুল, উচ্ছে (করলা), কাকরোল ইত্যাদি।

এর মধ্যে ঢেঁড়স বা ভিনডি *(Abelmoscus esculentus) Malvaceae* গোত্রের উদ্ভিদ, বেগুন *(Solanum melongena)* এবং টম্যাটো *(Lycopersicon lycopersicum) Solanaceae* গোত্রের উদ্ভিদ, শিম *(Lablab purpureus)* এবং বরবটি *(Vigna sinensis) Fabaceae* গোত্রের উদ্ভিদ, কাঁচকলা *(Musa paradisiaca) Musaceae* গোত্রের উদ্ভিদ।

মিষ্টিকুমড়া *(Cucurbita maxima),* চালকুমড়া *(Benincasa hispida),* লাউ *(Lagenaria vulgaris)* শসা (এবং ক্ষিরা) *(Cucumis sativus),* পটল *(Trichosanthes dioica),* চিচিঙ্গা *(Trichosanthes anguina),* ঝিংগা *(Luffa acutangula),* ধুনদুল *(Luffa cylindrica),* করলা *(Momordica charantia),* কাকরোল *(Momordica cochinchinensis)* এই দশটি ফল *Cucurbitaceae* গোত্রের উদ্ভিদ। এই গোত্রের সব উদ্ভিদই লতানো।

শাক হিসেবে উল্লেখযোগ্য হলো পালংশাক *(Spinacea oleracea, F. chenopodiaceae),* পুঁইশাক *(Basella alba, F. Barellaceae),* কলমিশাক *(Ipomoea aquatica, F. convolvulaceae),* লালশাক, মূলাশাক, লাউশাক, আমরুল শাক, হেলেঞ্চা শাক, গিমা শাক। নিমপাতা, সজিনা পাতা, থানকুনি পাতা এ গুলোও শাক হিসেবে খাওয়া হয়, তবে ঔষুধ হিসেবে।

উপরে উল্লিখিত শাক-সবজির মধ্যে কেবল মাত্র কাঁচকলা-ই একবীজ পত্রী উদ্ভিদ।

ফল (Fruits)

শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে প্রতিদিন কোন না কোন ফল খাওয়া উচিৎ। ফলে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ লবন আছে। রান্না না করে খাওয়া হয় বলে ফলের ভিটামিন ও খনিজ লবন নষ্ট হয় না এবং দেহ সহজেই গ্রহন করতে পারে। বাংলাদেশে অনেক ফল আছে, এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফল সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

১। আম ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Mangifera indica* (গোত্র- Anacardiaceae). আম গাছ বড় বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। আমকে ফলের রাজা বলা হয়। এতে শর্করা, ভিটামিন- বি, ও সি এবং বেশ কিছু খনিজ লবন আছে। আমের বিভিন্ন জাতের মধ্যে লেংড়া, ফজলি, গোপালভোগ, হিমসাগর ইত্যাদি এধান। বাংলাদেশের সব জেলাতেই আম উৎপন্ন হয় তবে রাজশাহীর আম উৎকৃষ্ট।

২। কলা ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Musa paradisiaca* var. *sapientum* (গোত্র- Musaceae). সারা বছরই কলা পাওয়া যায়। কলাতে ভিটামিন এ, বি, সি, ডি এবং ই আছে। কলা বেশ পুষ্টিকর।

৩। কাঁঠাল ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus heterophyllus* (গোত্র- Moraceae) কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল গাছ বড় বৃক্ষ। কাঁঠাল একটি যৌগিক ফল। বাংলাদেশের সব উঁচু অঞ্চলেই কাঁঠাল জন্মে। কাঁঠালে বেশ পরিমান আমিষ, শর্করা, খনিজ লবন এবং ভিটামিন- এ ও বি থাকে। কাঁঠাল অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল। ফলের বর্জ্য পশুর উপাদেয় খাদ্য।

৪। লিচু ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Litchi chinensis,* (গোত্র- Sapindaceae). লিচুর বীজের তৃতীয় ত্বক, যা এরিল নামে পরিচিত, তা খাওয়া হয়। দিনাজপুর ও রাজশাহীর লিচু সবচেয়ে ভাল।

৫। আনারস ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Ananas comosus,* (গোত্র- Bromeliaceae). আনারস একটি যৌগিক ফল। আনারসে প্রচুর ক্যারোটিন ও ক্যালসিয়াম আছে। এতে ব্রোমেলিন নামক রাসায়নিক পদার্থ আছে যা ক্রিমি নাশক হিসেবে কাজ করে।

৬। পেয়ারা ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Psidium guajava* (সিডিয়াম গুয়াইভা, F. Myrtaceae). পেয়ারাতে প্রচুর পরিমান ভিটামিন- সি থাকে।

৭। তরমুজ ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Citrullus vulgaris*, (গোত্র- Cucurbitaceae). ফল শীতল কারক।

৮। কালজাম ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Syzygium cumini* (গোত্র- Myrtaceae). জাম রক্ত পরিষ্কারক। বীজ ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রন করে।

৯। কুল/বরই ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Zizyphus mauritiana,* (গোত্র- Rhamnaceae). বরই একটি শর্করা সমৃদ্ধ ফল।

১০। পেঁপে ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Carica papaya,* (গোত্র- Caricaceae). পেঁপে একটি বারমাসি ফল। এটি শীতল কারক, হজম কারক এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূরকারি।

এছাড়া আমড়া *(Spondias dulcis, F-Anacardiaceae),* আমলকি *(Phyllanthus emblica, F-Euphorbiaceae),* জাম্বুরা *(Citrus grandis, F. Rutaceae),* সফেদা *(Manilkara. zapota, F. Sapotaceae),* বেল *(Aegle marmelos, F. Rutaceae)* কামরাঙ্গা *(Averhoa carambola, F. Averrhoaceae),* শরিফা *(Annoka reticulata)*, আতা *(Annona squamosa, F. Annonaceae),* ডালিম *(Punica granatum, F. punicaceae),* কদবেল *(Feronia limonia, F. Rutaceae),* আঙ্গুর *(Vitis vinifera, F. Vitaceae)* ইত্যাদি ফলও বেশ পরিমানে জন্মে থাকে।

পানীয় (Beverage)

যা পান করা হয় তাই পানীয়। আখের রস, খেজুরের রস, ডাবের পানি, লেবুর সরবত এ গুলো পানীয়। তবুও পানীয় বলতে সাধারণত: চা ও কফিকে বুঝায়। চা এবং কফিতে ক্যাফেইন (caffeine) নামক অ্যালকালয়েড আছে যা মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রকে উদ্দীপনা প্রদান করে।

১। চা ঃ বৈজ্ঞানিক নাম Camellia sinensis (=Thea sinensis) গোত্র- Theaceae. বন্য অবস্থায় চা ছোট বৃক্ষ জাতীয় কিন্তু কৃষি অবস্থায় বার বার ছাটাই করার মাধ্যমে গুল্ম জাতীয় ঝোঁপে পরিনত হয়। চা বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরি ফসলের মধ্যে একটি। এর মাধ্যমে প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫৩টি চা বাগান আছে, এর মধ্যে ১৩১টি ই বৃহত্তর সিলেট জিলায়। বাংলাদেশের চা বাগানে ভূমির পরিমান প্রায় ১,১০,০০০ একর।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শীর্ষ মুকুলের দু'টি কচি পাতাই উৎকৃষ্ট চা-প্রদান করে থাকে। 'একটি কুঁড়ি দু'টি পাতা' - এই হলো চা-এর পরিচিতি।

বাগান থেকে সংগ্রহ করার পর i) উইদারিং, ii) রোলিং, iii) ফার্মেন্টেশন, iv) ফায়ারিং এবং v) গ্রেডিং এই পাঁচটি পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ায় চা পাতাকে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। এর মধ্যে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ার সময় পাতা তাম্র বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সুগন্ধ যুক্ত হয়।

২। কফি ঃ উদ্ভিদের নাম *Coffea arabica,* গোত্র- Rubiaceae. বাংলাদেশে এর চাষ খুবই সীমিত। ব্যাপক ব্যবহারের কারণে বিদেশ থেকে কফি আমদানি করা হয়।

ব্যবহৃত অংশ ঃ বীজ। বীজ সংগ্রহের পর রোষ্টি এর মাধ্যমে ব্যবহারের, উপযোগী করা হয়।

৩। ডাব ঃ নারিকেল অর্থাৎ *Cocos nucifera* (F. Arecaceae) উদ্ভিদের কচি ফলই ডাব হিসেবে পরিচিত। ডাবের পানি অত্যন্ত পুষ্টিকর। এতে প্রচুর পুষ্টি উপাদান থাকে। বাজারের বোতলজাত পানীয় ব্যবহার না করে ডাবের পানি ব্যবহার করা উচিত।

সারসংক্ষেপ

- উদ্ভিদের মূল, কান্ড, ফুল ও ফল যা রান্না করে তরকারি হিসেবে খাওয়া হয় তাই সবজি হিসেবে পরিচিত। শরীর গঠনের জন্য নিয়মিত পরিমানমত সবজি খাওয়া উচিৎ।
- ফলে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ লবন থাকে, তাই সম্ভব হলে প্রতিদিনই কিছু পরিমান ফল খাওয়া উচিৎ। কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল।
- চা জন্মানোর জন্য চাই উঁচুস্থান, অধিক বৃষ্টিপাত, অধিক জলীয় বাষ্পপূর্ন বায়ু, নিম্নতাপমাত্রা এবং অ্যাসিডিক মাটি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

১। আলু কোন ধরনের সবজি?
ক. মূল খ. কান্ড
গ. ফুল ঘ. ফল

২। কোনটি এক বীজপত্রী উদ্ভিদ হতে পাই?
ক. মূলা খ. আলু
গ. কাঁচ কলা ঘ. লাউ

৩। এরিল কোন ধরনের উদ্ভিদে সৃষ্টি হয়?
ক. কাঁঠাল খ. লিচু
গ. আম ঘ. কলা

৪। ব্রোমেলিন কোথায় আছে?
ক. আনারস খ. কালজাম
গ. পেঁপে ঘ. আমলকি

৫। কোথায় ক্যাফেইন আছে?
ক. কঁচি চা পাতায় খ. আনারসে
গ. আমলকিতে ঘ. পেঁপেতে

৬। বাংলাদেশে কয়টি চা-বাগান আছে?
ক. ১০০ টি খ. ১৩১ টি
গ. ১৫৩ টি ঘ. ১৮৩ টি

পাঠ- ৪ ঃ কাষ্ঠ এবং তন্তু

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কাষ্ঠ প্রদানকারি উদ্ভিদের নাম লিখতে পারবেন।
- ভাল কাঠের গঠন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- নিম্নমানের কাঠের গঠন বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবেন।
- তন্তু বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- তন্তুর প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- তন্তুর বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কাঠ (Timber)

বাড়ি ঘর তৈরি, আসবাবপত্র তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে আমরা কাঠ ব্যবহার করে থাকি। নৌকা, গরুর গাড়ি, রেলওয়ে পিপার, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি তৈরি করতেও কাঠের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও কাঠের বহুবিধ ব্যবহার আছে। মোট কথা কাঠ আমাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

কাঠ বলতে সাধারণত: দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ (সেগুন, শাল, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি) এবং ব্যক্তবীজি উদ্ভিদের (পাইন, দেউদার ইত্যাদি) সেকেন্ডারি বৃদ্ধির ফলে গঠিত জাইলেম টিস্যুকে বুঝায়। জাইলেম একটি যৌগিক টিস্যু। এতে ট্রাকিড, ভেসেল, উডফাইবার, উডপ্যারেন কাইমা কোষ থাকে।

কোন কাঠে ভেসেল এবং উডপ্যারেনকাইমার তুলনায় ট্রাকিড এবং উডফাইবার বেশি থাকলে সে কাঠের মান ভাল। আবার কোন কাঠে ট্রাকিড এবং উড ফাইবারের তুলনায় ভেসেল এবং উড প্যারেনকাইমা বেশি থাকলে সে কাঠের মান খারাপ, অর্থাৎ সে কাঠ নিম্নমানের। সাধারণত: দেখা যায় যে কাঠের ঘনত্ব যত বেশি, সে কাঠ তত বেশি দৃঢ়। সার কাঠ অসার কাঠ অপেক্ষা ভাল, কারণ অসার কাঠ সহজেই ছত্রাক ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। বাঁকা গ্রেন-এর চেয়ে সোজা গ্রেনের কাঠ অপেক্ষা কৃত উন্নত মানের। কাঠ গঠনকারি উপাদান কোষ গুলো গাছের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল থাকলে তাকে সোজা গ্রেন বলে।

কাজেই কাঠের গুণাগুণ নির্ভর করে এর গ্রেন, টেক্সার (কাঠ গঠন কারি কোষ সমূহের তুলনামূলক অবস্থান), স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, অনমনীয়তা, ঘনত্ব ও আর্দ্রতা এসব বৈশিষ্ট্যের উপর। আর্দ্রতা যতবেশি হবে, মান তত কম হবে।

সেগুন কাঠে ট্রাকিড এবং উড ফাইবারের তুলনায় ভেসেল এবং উড প্যারেনকাইমা কম, গ্রেন সোজা, টেক্সার ভাল, দৃঢ়, অনমনীয়, কম আর্দ্র, তাই সেগুন কাঠ ভাল। আম কাঠ তার উল্টো, তাই আম কাঠ সেগুন কাঠের তুলনায় নিম্নমানের। বাংলাদেশে কাঠ প্রদানকারি বৃক্ষের সংখ্যা অনেক। এখানে মাত্র কয়েকটি কাঠ প্রদানকারি বৃক্ষের নাম, কাঠের ধরন ও ব্যবহার দেয়া হলো।

১। সেগুন ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Tectona grandis*, গোত্র- Verbenaceae, এর ব্যবসায়িক নাম টিক। এটি বিরাট পত্রঝরা বৃক্ষ। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিকল্পিত চাষ হয়।

কাঠ ঃ সেগুন কাঠ অত্যন্ত উন্নতমানের কাঠ। এটা বাংলাদেশে উৎপাদিত সেরা কাঠ। সেগুন কাঠ শক্ত, ভারী, মজবুদ, তৈলাক্ত এবং হালকা সোনালী বর্ণের। এটি ছত্রাক ও পোকার আক্রমন প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সহজে ভেঙ্গে, ফেটে, কুচকিয়ে বা বাঁকা হয়ে যায় না।

ব্যবহার ঃ মূল্যবান আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি তৈরিতে হ্যবহৃত হয়।

২। শাল ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Shorea robusta*, গোত্র- Dipterocarpaceae, এটি বৃহৎ পত্রঝরা বৃক্ষ। মূলগাছের শাখার থেকে জন্মানো গাছ গজারী গাছ হিসেবে পরিচিত। আমাদের ভাওয়াল মধুপুর বনের গাছ মূলত: গজারী। উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলেও এ গাছ আছে।

কাঠ ঃ কাঠ অনেকটা লাল বর্ণের, অত্যন্ত শক্ত, মজবুত ও ভারী। এর গ্রেন সোজা, পানিতে টিকসই।

ব্যবহার ঃ খুঁটি, খাম, রেলওয়ে পিপার, ঘরের বর্গা, দরজা-জানালার ফ্রেম ইত্যাদি কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়।

৩। গর্জন ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Dipterocarpus turbinatus,* গোত্র- Dipterocarpaceae. গর্জন বেশ উঁচু ও বিশাল বৃক্ষ। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে অধিক পাওয়া যায়। সিলেটের বনেও পাওয়া যায়।

কাঠ ঃ কাঠ হালকা লাল বা খয়েরী বর্ণের। এটি বেশ শক্ত, গ্রেন অত্যন্ত সোজা।

ব্যবহার ঃ ঘরের বর্গা, বিভিন্ন আসবাবপত্রের ফ্রেম, দরজা-জানালার ফ্রেম, রেলওয়ে পিপার ইত্যাদি কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়।

৪। গামারী ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Gmelina arborea,* গোত্র- Verbenaceae. এটি বেশ বড় বৃক্ষ। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ভাওয়াল ও মধুপুরের বনে এটি জন্মে থাকে।

কাঠ ঃ হালকা হলুদ বা সাদাটে, শক্ত, সোজা গ্রেন বিশিষ্ট।

ব্যবহার ঃ দরজা-জানালা এবং আসবাবপত্র তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়।

৫। মেহগিনি ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Swietenia mahagoni,* গোত্র- Meliaceae. মেহগিনি বৃহৎ চির সবুজ বৃক্ষ। বসন্ত কালে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই পাতাঝরে গিয়ে সাথে সাথেই সমস্ত গাছে পাতা গজায়। মেহগিনি একক বৃক্ষ হিসেবে পত্র ঝরা, তবে দলগত ভাবে চিরসবুজ।

কাঠ ঃ লাল খয়েরী বর্ণের, অত্যন্ত শক্ত, ভারী, সহিষ্ণু এবং স্থায়ী।

ব্যবহার ঃ উত্তম আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, গরুর গাড়ি, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।

৬। কাঁঠাল ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus heterophyllus,* গোত্র- Moraceae. কাঁঠাল প্রধানত: ফলের জন্যই লাগানো হয়।

কাঠ ঃ কাঠ হলুদ বা হলুদ-খয়েরী বর্ণের, শক্ত, ভারী, স্থায়ী।

ব্যবহার ঃ ভাল আসবাবপত্র, দরজা-জানালা ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৭। শিরিষ ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Albizia lebbeck,* গোত্র- Fabaceae. এটি উঁচু পত্রঝরা বৃক্ষ। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

কাঠ ঃ খয়েরী বা হালকা-কালো বর্ণের, বেশভারী, মজবুদ, স্থায়ী। এতে পোকার আক্রমন হয় না, ছত্রাক ধরে না।

ব্যবহার ঃ আসবাবপত্র, দরজা-জানালার ফ্রেম ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

৮। সুন্দরী ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Heritiera fomes,* গোত্র- Sterculiaceae. সুন্দর বনের প্রধান বৃক্ষ। বৃক্ষ মধ্যমাকৃতির।

কাঠ ঃ কাঠ লালচে-খয়েরী, বেশ শক্ত। পানিতে কম ক্ষতি হয়।

ব্যবহার ঃ খুঁটি, নৌকা, বিভিন্ন ফ্রেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৯। শিশু ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Dalbergia sissoo,* গোত্র- Fabaceae. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে অধিক পাওয়া যায়। এটি বেশ বড় বৃক্ষ।

কাঠ ঃ গাঢ় খয়েরী বর্ণের, শক্ত, সহিষ্ণু, মজবুত এবং স্থায়ী। পোকার আক্রমন প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।

ব্যবহার ঃ ভাল আসবাবপত্র, গরুর গাড়ি, নৌকা, খেলনা, খুঁটি প্রভৃতি কাজে অধিক ব্যবহার করা হয়।

১০। চাপালিশ ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus chaplasha,* গোত্র- Moraceae. এটি চির সবুজ বৃক্ষ। সিলেটের বনে অধিক পাওয়া যায়।

কাঠ ঃ শক্ত ও মজবুত।

ব্যবহার ঃ আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

নিম্নমানের কাঠের মধ্যে দেবদারু (*Polyanthia longifolia,* F-Annonaceae), ছাতিম (*Alstonia scholaris,* F-Apocynaceae), কদম (*Anthocephalus chinensis,* F-Rubiaceae), শিমুল (*Bombax ceiba,* F-Bombacaceae) ইত্যাদি প্রধান। এদের কাঠ হালকা, নরম। প্যাকিং বাক্স, দেয়াশলাই শিল্পেই এদের ব্যবহার বেশি হয়।

আম, জাম, নিম, রেনডি কড়ই, তেলসুর ইত্যাদি উদ্ভিদের কাঠও বেশ ব্যবহার হয়।

তন্তু (Fibres)

বস্ত্র আমাদের মৌলিক চাহিদার একটি। বস্ত্রের প্রধান উপকরণ হলো তন্তু। কাজেই মানুষের জীবনে তন্তু এবং তন্তু উৎপাদনকারি উদ্ভিদের গুরুত্ব সীমাহীন।

প্রায় সব উদ্ভিদতন্তুই স্ক্লেরেনকাইমা কোষ। তন্তুর ব্যবহার বহুবিধ। ব্যবহার অনুযায়ী তন্তু পাঁচ প্রকার; যথা- (১) টেক্সটাইল তন্তু, (২) ফিলিংতন্তু, (৩) মোটা বুনন তন্তু, (৪) ব্রাশতন্তু, (৫) কাগজ তৈরি তন্তু।

১। টেক্সটাইল তন্তু ঃ সূতা, দড়ি, চট, ইত্যাদি তৈরি করার জন্য বস্ত্রকল, হোসিয়ারী ও পাটকলগুলোতে যে তন্তু ব্যবহার করা হয় তা হলো টেক্সটাইল তন্তু; যেমন- তুলা, পাট ইত্যাদি।

i) তুলা ঃ বস্ত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ উপকরণ তুলা, যা কার্পাস তুলা নামে পরিচিত। Gossypium গণের (গোত্র- Malvaceae) বিভিন্ন প্রজাতি হতে তুলা পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রধান হলো G.herbaceum.। বীজের সার্ফেসে তুলা সৃষ্টি হয়। উৎপত্তিস্থল হিসেবে এটি সার্ফেস তন্তু।

ব্যবহার ঃ কার্পাসতুলা হতে বিভিন্ন প্রকার সূতীবস্ত্র তৈরি হয়। তুলা সেলুলোজ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। টায়ার প্রস্তুতেও তুলা ব্যবহৃত হয়। হাসপাতালেও তুলার ব্যবহার আছে।

ii) পাট ঃ পাঠ Corchorus গণের (গোত্র- Tiliaceae) দুটি প্রজাতি হতে আহরণ করা হয়। একটি হলো সাদা পাট, সূতী পাট বা দেশি পাট যার বৈজ্ঞানিক নাম *Corchorus capsularis.* এর আঁশ সাদা, ফল গোলাকার, বীজ খয়েরী, অপরটি হলো তোষাপাট, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Corchorus olitorius.* এর আঁশ কিছুটা সোনালী বর্ণের, ফল লম্বা, বীজ নীল।

পাটের আঁশ হলো কান্ডের সেকেন্ডারি ফ্লোয়েম টিস্যুর ফাইবার। উৎপত্তিগত দিক থেকে এটি বাস্টতন্তু। মেস্তাপাট (*Hibiscus sabdariffa* var. *altissima, F. Malvaceae*), ভ্রকনাফ (*Hibiscus cannabinus;* F. Malvaceae); শনপাট (*Crotalaria juncea,* F. Fabaceae) ইত্যাদি হতেও আঁশ পাওয়া যায়, যা পাটেরই মতো। এগুলোও বাস্ট ফাইবার।

ব্যবহার ঃ চট, *গানিব্যাগ*, কাপড়, কার্পেট, কৃত্রিম পশম, দড়ি, শিকা ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

iii) কয়ের ঃ নারিকেলের (*Cocos nucifera,* গোত্র Arecaceae) ফলের ছোবরা হতে শক্ত আঁশ পৃথক করা হয়। এই আঁশকে কয়ের বলে। উৎপতিগত ভাবে এটি উডতন্তু।

ব্যবহার ঃ দড়ি, কাছি ইত্যাদি তৈরিতে কয়ের ব্যবহার করা হয়। পাটের রশি হতে কয়ের -এর রশি অধিক মজবুত। কয়ের দিয়ে ব্রাশও তৈরি করা হয়।

২। ফিলিং তন্তু ঃ লেপ, তোষক, বালিশ, বসবার গদি প্রভৃতি তৈরি করতে যে তন্তু ব্যবহার করা হয়, তা হলো ফিলিং তন্তু।

শিমুলতুলা ঃ শিমুল -এর বৈজ্ঞানিক নাম *Bombax ceiba,* গোত্র- Bombacaceae. শিমূল বড় বৃক্ষ। এর ফলের অভ্যন্তরীন গাত্রে আঁশের সৃষ্টি হয়। তাই শিমুল তুলাও সার্ফেস ফাইবার।

ব্যবহার ঃ বালিশ, লেপ, গদি ইত্যাদি তৈরি করতে শিমুল তুলা ব্যবহার করা হয়। এ কাজে কার্পাস তুলা, ছোবরা, পাটের অংশ বিশেষও ব্যবহার করা হয়।

৩। মোটা বুনন তন্তু ঃ এ জাতীয় তন্তু বেশ কাষ্ঠল ও স্থিতিস্থাপক। তালের আঁশ, বাঁশ, বেত ইত্যাদি এ জাতীয় তন্তুর উদাহরণ।

বেত ঃ *Daemonorops jenkinsianus, Calamus rotang* (গোত্র- Arecaceae) ইত্যাদি উদ্ভিদের কান্ড হতে বেতের আঁশ সংগ্রহ করা হয়। বেতের ব্যবহার বহুবিধ।

মুর্তার (*Clinogyne dichotoma,* F. Marantaceae) কান্ডের আঁশ দিয়ে শীতলপাটি তৈরি করা হয়; মাদুরকাঠির (*Cyperus tegetium;* F. Cyperaceae) কান্ড দিয়ে মাদুর তৈরি করা হয়; হোগলার (*Typha elephantena,* T. angustata, F. Typhaceae) কান্ড দিয়ে হোগলাচাটাই তৈরি করা হয় এবং বাঁশের (*Bambusa* গণের বিভিন্ন প্রজাতি, F. Poaceae) কান্ড হতে আঁশ সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রকার চাটাই তৈরি করা হয়।

৪। ব্রাশতন্তু ঃ তাল এবং নারিকেলের পত্রকের ডাটা দিয়ে ঝাড়ু, ব্রাশ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এগুলো বান্ডল তন্তু, কারণ পত্রকের মধ্যশিরা অর্থাৎ প্রধান ভাস্কুলার বান্ডলটিই একটি তন্তু হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫। কাগজ তৈরি তন্তু ঃ এসব তন্তু কাগজ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। টেক্সটাইল তন্তু থেকে শুরু করে অনেক তন্তুই কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাঁশ, আখের ছাবা, পাট, গাছের কান্ড ইত্যাদি কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার অনুযায়ী তন্তু পাঁচ প্রকার কিন্তু উৎপত্তিগত ভাগে তন্তু চার প্রকার, যথা ১। বাস্টতন্তু; ২। সার্ফেস তন্তু, ৩। উড তন্তু এবং ৪। বান্ডল তন্তু।

সার সংক্ষেপ

- ব্যাক্তবীজি উদ্ভিদ ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে সেকেন্ডারি বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট জাইলেম টিস্যুকে কাঠ বা টিম্বার বলা হয়। সেগুন কাঠ সবচেয়ে ভাল কাঠ।
- উদ্ভিদের স্ক্লেরেনকাইমা কোষই আঁশ বা তন্তু হিসেবে পরিচিত। পাটের আঁশ পাই কান্ডের সেকেন্ডারি ফ্লেয়েম হতে আর কার্পাসতুলার আঁশ পাই বীজের সার্ফেস হতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

১। কোনটি কাঠের উপাদান নয়।
ক. ট্রাকিড
খ. উড ফাইবার
গ. সিভটিউব
ঘ. ভেসেল

২। কোনটি থেকে বাণিজ্যিক 'টিক' পাওয়া যায়?
ক. *Shorea robusta*
খ. *Tectona grandis*
গ. *Heritiera fomes*
ঘ. *Dipterocarpus turbinatus*

৩। কোনটি দিয়ে প্যাকিং বাক্স তৈরি হয়?
ক. *Bombax ceiba*
খ. *Tectona grandis*
গ. *Shorea robusta*
ঘ. *Gmelina arborea*

৪। কোনটি বাস্ট তন্তু?
ক. কার্পাস তুলা
খ. শিমুল তুলা
গ. পাট
ঘ. কয়ের

৫। কোনটি দিয়ে শীতল পাটি তৈরি করা হয়?
ক. *Clinogyne dichotoma*
খ. *Typha angustata*
গ. *Cyperus tegetium*
ঘ. *Calamus rotang*

৬। পাট গাছের গোত্র নাম কি?
ক. Malvaceae
খ. Cyperaceae
গ. Tiliaceae
ঘ. Bombacaceae

পাঠ- ৫ ঃ ভেষজ উদ্ভিদ

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ভেষজ উদ্ভিদ বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কিছু ভেষজ উদ্ভিদের নাম লিখতে পারবেন।
- উল্লেখযোগ্য ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার্য অংশ সনাক্ত করতে পারবেন।
- ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবেন।
- কিছু অ্যালকালয়েডের নাম বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ভেষজ উদ্ভিদের আনুমানিক সংখ্যা বলতে পারবেন।

যে সব উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ হতে জীবন রক্ষাকারি ওষুধ পাওয়া যায় সেসব উদ্ভিদকে ভেষজ উদ্ভিদ বলা হয়, অর্থাৎ ভেষজ গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদই ভেষজ উদ্ভিদ। বর্তমান হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে ভাস্কুলার উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার প্রজাতি, তবে এ সংখ্যা অরো বাড়তে পারে বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। এর মধ্যে অন্তত: পাঁচশত উদ্ভিদ ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে স্বীকৃত। এখানে মাত্র কয়েকটি উদ্ভিদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ব্যবহার্য অংশ এবং ব্যবহার দেয়া হলো।

১। অর্জুন ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Terminalia arjuna,* গোত্র- Combretaceae. এটি একটি বৃক্ষ, বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায় পাওয়া যায়। সাধারণত: লাগানো হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ বাকল। বাকলে অর্জুনিন, অর্জুনেটিন অ্যালকালয়েড আছে।

ব্যবহার ঃ হৃদরোগের একটি উত্তম ওষুধ। বাকল রাত্রিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে পানি খেতে হয়; অথবা দুধের সাথে বাকল সিদ্ধ করে ঐ দুধটুকু খেতে হয়। বাসক পাতার রস ও মধুর সাথে অর্জুন ছাল চূর্ন সেবন করলে যক্ষা রোগ আরোগ্য হয়।

২। আপাং ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Achyranthes aspera,* গোত্র- Amaranthaceae. আপাং একটি বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ, সাধারণত: পতিত জায়গায় জন্মে। এটি উপৎল্যাংগা বা বিলাইখামছি নামেও পরিচিত।

ব্যবহার্য অংশ ঃ প্রধানত: মূল, তবে কান্ড ও পাতাও ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার ঃ মূলের রস খেলে প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া দূর হয়, প্রচুর প্রস্রাব হয়। এর মূল একজিমার ভাল ওষুধ। এর ছাই অ্যান্টাসিড হিসেবে কাজ করে।

৩। উলট কম্বল ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Abroma augusta,* গোত্র Sterculiaceae. এটি গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। উলটকম্বল বন্যভাবেও জন্মে আবার লাগানোও হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ মূল, পাতা, বাকল, বোঁটা ও ডাঁটা। মূলের বাকলে অ্যাব্রোমিন, কোলিন, বিটেইন ইত্যাদি অ্যালকালয়েড আছে।

ব্যবহার ঃ পাতার বোঁটা ভিজানো পানি আমাশয়, শারীরিক দুর্বলতা এবং প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া দূর করে। পাতা ও ডাঁটা ভিজানো পানি খেলে গনোরিয়া ভাল হয়। মূলের ছাল খেলে কষ্টদায়ক ঋতুস্রাব, অনিয়মিত ঋতুস্রাব নিয়মিত ও স্বাভাবিক হয়।

৪। আশশ্যাওড়া ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Glycosmis arborea,* গোত্র- Rutaceae. এটি মটকিলা, দাঁতনগাছ নামেও পরিচিতি। এটি একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই জন্মে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ মূল, পাতা, ফল। এর মূলে অনেক অ্যালকালয়েড আছে, গ্লাইকোসাইনিন একটি।

ব্যবহার ঃ মূল একজিমার ভাল ওষুধ। পাতার মন্ডও একজিমায় ব্যবহার করা হয়। পাতার রস কৃমি নাশক, জ্বর নিবারক, এমন কি ম্যালেরিয়া জ্বর ভাল হয়। ফল কৃমি নাশক এবং আমাশয় নাশক। অনেকেই এর ডাল দিয়ে দাঁত মাজার কাজ করে থাকেন।

৫। কালমেঘ ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Andrographis paniculata,* গোত্র- Acanthaceae. এটি কল্পনাথ এবং মহাতিতা নামেও পরিচিত। বাজারে চিরতা নামে এটি বিক্রি হয়। কালমেঘ একটি বর্ষজীবি বীরুৎ।

ব্যবহার্য অংশ ঃ সমস্ত গাছ, বিশেষ করে পাতা। এতে কালমেঘিন, অ্যান্ড্রোগ্রাফোলাইড ইত্যাদি আছে।

ব্যবহার ঃ এর রস সর্বোত্তম লিভার টনিক। এছাড়া এটি কৃমিনাশক, জ্বর নাশক, এমন কি ডায়রিয়া, আমাশয় এবং সাধারন দুর্বলতায়ও ভাল কাজ করে।

৬। কেশরাজ ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Eclipta prostrata,* গোত্র- Asteraceae. এটি কালকেশী, কেশুতি, ভৃঙ্গরাজ ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এটি একটি ছোট বীরুৎ যা বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই জন্মে থাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ সমস্ত গাছ, বিশেষতঃ পাতা। এতে ইক্লিপটিন অ্যালকালয়েড আছে।

ব্যবহার ঃ এর রস নারিকেল তেলের সাথে মিশিয়ে মাথায় মাখলে মাথা ঠান্ডা থাকে, চুল পাকা বন্ধ হয় এবং চুল দ্রুত বৃদ্ধি পায়। চুল কালো ও লম্বা করার জন্য এটি বেশ কার্যকর। এর রস টনিক হিসেবেও কাজ করে। সর্দি, কাশি, লিভার দোষ ইত্যাদি রোগেও এটি কার্যকর। এর মন্ড কাটা বা ক্ষত স্থানে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়, ক্ষত আরোগ্য হয়।

৭। কুরচি ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Holarrhena antidysenterica,* গোত্র- Apocynaceae. এটি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ জেলায় বেশ জন্মে থাকে। এর সাদা ফুল বসন্ত কালে ফুটে থাকে। ফুল সুগন্ধি যুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ ঃ বাকল। বাকলে কয়েক ধরনের অ্যালকালয়েড আছে।

ব্যবহার ঃ এটি আমাশয়ের উত্তম ওষুধ। এর রস জ্বর নিরাময় করে এবং টনিক হিসেবেও কাজ করে।

৮। ছাতিম ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Alstonia scholaris,* গোত্র- Apocynaceae. এটি একটি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায়ই ছাতিম গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ বাকল। এতে অনেক অ্যালকালয়েড আছে, স্ট্রিকটামাইন, স্কোলারাইন, পিকরিনাইন ইত্যাদি অন্যতম।

ব্যবহার ঃ ক্রনিক ডায়রিয়া ও আমাশয়ের এটি ভাল ওষুধ। জ্বর নিরাময়েও এর ভাল ক্ষমতা আছে। চর্মরোগেও এর ব্যবহার আছে। এতে অ্যান্টি ক্যানসার গুণ আছে।

৯। তুলসী ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Ocimum sanctum,* গোত্র Lamiaceae.

ব্যবহার্য অংশ ঃ পাতা।

ব্যবহার ঃ পাতার রস কাশি, হাঁপানি, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি রোগে উত্তম ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তুলসী পাতার রস, আদার রস ও মধু মিশিয়ে খেলে ভাল উপকার পাওয়া যায়।

১০। থানকুণি ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Centella asiatica,* গোত্র- Ammiaceae. এটি একটি বীরুৎ, আগাছা হিসেবে দেশের সর্বত্র জন্মিতে দেখা যায়। পাতা বাজারে বিক্রি হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ সমস্ত গাছ।

ব্যবহার ঃ ইহা আয়ুবর্ধক, মেধা বর্ধক, স্মৃতিবর্ধক হিসেবে পরিচিত। ভারতের বহু স্থানে স্মৃতি শক্তির বৃদ্ধির জন্য থানকুণির রস খাওয়ানো হয়। থানকুনির গুড়া বা রস খাওয়ার পর দুধ খাওয়া ভাল। থানকুনির রস একটি ভাল টনিক। এটি উত্তম রক্তপরিষ্কারক। আমাশয় এবং ডায়রিয়ায় এর ব্যাপক ব্যবহার আছে। এটি কুষ্ঠ সহ অধিকাংশ চর্মরোগ নিরাময়ের ক্ষমতা রাখে।

১১। দাদমর্দন ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Cassia alata,* গোত্র- Fabaceae. এটি একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। শীতকালে ফুল ফোটে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ পাতা। এতে ক্রাইসোফ্যানল, ক্রাইসোফ্যানিক অ্যাসিড, কেম্‌ফেরোল আছে।

ব্যবহার ঃ পাতার রস দাদ রোগ নিরাময়ের জন্য অব্যর্থ। শরীরের যে স্থানে দাদরোগ (দাউদ= ringworm) হয়েছে সে স্থানটুকু পরিষ্কার করে পাতার মন্ড অথবা রস লাগিয়ে দিয়ে ২/১ দিনের মধ্যেই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হবে। পাতা জোলাপ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

১২। ধুতুরা ঃ ধুতুরা উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম *Datura metel,* গোত্র- Solanaceae. ধুতুরা একটি ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বনের ধারে বা রাস্তার দু'পাশে ধুতুরা জন্মিতে দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ পাতা, বীজ। এতে hyoscyamine, atropine, scopolamine প্রভৃতি অ্যালকালয়েড আছে।

ব্যবহার ঃ ধুতুরার বীজ ব্যাথা নিবারক, উত্তেজক, পেটের গ্যাস নিবারক, হজম কারক, এবং পরিমানে অধিক হলে বেহুঁশ কারক। তেলের সাথে বীজ বেটে মাথায় মাখলে উকুন মরে যায়। পাতার রস বা পাতার ধূম হাঁপানিতে হিতকর। পাতার রস ক্রিমি নাশক।

১৩। নিম ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Melia azadirachta,* গোত্র- Meliaceae. নিম বড় বৃক্ষ।

ব্যবহার্য অংশ ঃ মূল ও কান্ডের বাকল, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ। নিমে তিক্ত পদার্থ, স্যাপোনিন এবং অ্যালকালয়েড্স আছে। তিক্ত পদার্থে নিমবিডিন, নিমবিন, নিমবিনিন, নিমবাইডোল এবং ব্যাকেয়ানিন আছে।

ব্যবহার ঃ নিমের ব্যবহার বহুবিধ। নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতে কোন প্রকার রোগ হয় না। এ জন্য প্রতিদিন নতুন ডাল নেয়া উচিৎ। একদিনের মাজা অংশ দিয়ে দ্বিতীয় দিন দাঁতমাজা ঠিক নয়। যারা নিয়মিত নিমপাতা খায় তাদের বসন্ত রোগ হয় না। পাতা বেটে বসন্তের গুটিতে দিলে গুটি ভাল হয়। নিম পাতা ক্ষতের পোকা নষ্ট করে, বিভিন্ন চর্ম রোগে উপকার করে। মূলের বাকলের রস খেলে গোলকৃমি মরে যায় বা পড়ে যায়। নিমপাতা ঘিতে ভেজে সেই ঘি ক্ষতে লাগালে ক্ষত তাড়াতাড়ি আরোগ্য হয়।

১৪। নিসিন্দা ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Vitex negundo,* গোত্র Verbenaceae নিসিন্দা গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ।

ব্যবহার্য অংশ ঃ এতে নিসিন্ডাইন অ্যালকালয়েড আছে।

ব্যবহার ঃ এটি বাতের ভাল ওষুধ, জ্বর নিবারক ও টনিক। নিসিন্দার ডাল দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত শক্ত ও মজবুত হয়। নিসিন্দার পাতা জ্বাল দিয়ে সেই পানি ব্যাথাযুক্ত স্থানে ঢাল্‌লে বাতের ব্যাথার উপশম হয়। এতে আঘাত জনিত ব্যথাও উপশম হয়। পাতার রস ক্ষত স্থানে দিলে ক্ষত তাড়াতাড়ি আরোগ্য হয়। তিল তেলের সাথে নিসিন্দার পাতা সিদ্ধ করে মাখলে চুলকানি সেরে যায়। পাতার রস কৃমি নাশক।

১৫। পুনর্নভা ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Boerhaavia repens,* গোত্র- Nyctaginaceae. এটি একটি শয়ান বীরুৎ, সচরাচর সর্বত্রই দেখা যায়। এটি পুনাইর শাক বলেও পরিচিত।

ব্যবহার্য অংশ ঃ সমস্ত উদ্ভিদ। প্রধান অ্যালকালয়েড পুনর্নভাইন।

ব্যবহার ঃ এটি মূত্র বর্ধক, শোথ রোগের মহৌষধ। পাতা শাক হিসেবে খেলেও উপকার পাওয়া যায়। মূত্র পাথরী হলে ১০ গ্রাম পুনর্নভার গুড়ো ৫ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে ২ কাপ পরিমান থাকা অবস্থায় নামিয়ে সকাল বিকাল দু'বেলা খেতে দিতে হবে। কিছু দিন খেলে প্রস্রাবের সাথে ছোট পাথর বের হয়ে যায়। অনিদ্রায় ও ইহা ভাল কাজ করে এবং আর্টিকেরিয়াতেও।

১৬। বাসক ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Adhatoda vasica,* গোত্র- Acanthaceae, বাসক একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ।

ব্যবহার্য অংশ ঃ পাতা; তাজা পাতার রস। ভ্যাসিকোলাইন, ভ্যাসিকোলিনাইন, অ্যানিসোটাইন, অ্যাডাটোডাইন প্রভৃতি অ্যালকালয়েড আছে এতে।

ব্যবহার্য ঃ শ্বাস ও কাশের যাবতীয় রোগে ইহা উপকারী। পাতার রস মধুসহ সেবন করলে কাশি ভাল হয়ে যায়। বাসক পাতার রস ১ সের, পিবুল ৪ তোলা, ঘি ৪ তোলা একত্রে সিদ্ধ করে ঠান্ডা করতে হবে এবং এর সাথে এক পোয়া মধু মিশালে তৈরি হয়ে বাসকাবলেহ। এই অবলেহ দিনে ১ তোলা মাত্রায় তিনবার করে খেলে সর্দি, হাঁপানি, ক্ষয়কাল প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

১৭। ব্রাহ্মী ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Bacopa moniera,* গোত্র- Scrophulariaceae. এটি একটি ছোট বীরুৎ। উপকূলীয় অঞ্চলে অধিক জন্মে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ সমস্ত উদ্ভিদ। এতে হার্পেস্টাইন এবং ব্রাহমাইন অ্যালকালয়েড আছে।

ব্যবহার ঃ ব্রেন, নার্ভ এবং হৃদযন্ত্রের টনিক হিসেবে এর প্রধান ব্যবহার। অনিদ্রা, হাঁপানী, বাত, কাশি প্রভৃতি অসুখে এর ব্যবহার আছে। যাইহোক, এর প্রধান ব্যবহার স্মৃতিশক্তি বর্ধক হিসেবে। ভারতে ব্রাহ্মীকে ব্রেনটনিক হিসেবে প্যাটেন্ট করা হয়েছে। সাধারনত এর পাতা ঘি-এ ভেজে খাওয়ানো হয়।

১৮। সর্পগন্ধা ঃ বৈজ্ঞানিক নাম Rauvolfia serpentina, গোত্র- Apocynaceae. এটি একটি ছোট বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ।

ব্যবহার্য অংশ ঃ মূলের বাকল। এতে ১৭ প্রকার অ্যালকালয়েড আছে। সার্পেনটিন এর মধ্যে অন্যতম।

ব বহার ঃ উঞ্চ র চাপ কমাক্ষত এটি একটি উ ম ওষুধ।

এছাড়া মুক্তাঝুরি (পাতার রস=হাঁপানির ওষুধ), শতমূলী (মূল=স্নিগ্ধকারি ও টনিক), আকন্দ (কস=দাদ, অর্শ ও জনডিস রোগে), অনন্তমূল (মূল-টনিক ও রক্ত পরিষ্কারক), গন্ধভেদুলী (পাতা-ডাইরিয়া, আমাশয় ও বাতের ওষুধ)। বনধনে (কচি ডগা-ডায়াবেটিস এর ওষুধ), গুলঞ্চ (কান্ড - জ্বর নিবারক, টনিক), বচ (রাইজোম - অরুচি, পেট ফাঁপায়, কাশিতে), বেল (ফল - কোষ্ঠ কাঠিন্য নিবারক), ঘৃতকুমারী (পাতার নির্যাস - আমাশয়ে, শূল বেদনায়), আনারস (পাতার রস - কৃমি নাশক), ঈশের মূল (মূল, পাতা - শ্বেতী রোগে), পাথরকুচি (পাতা-আমাশয়ে, পাথরীতে), বাঁদরলাঠি (ফলের শাঁস - বিরেচক) এ জাতীয় অসংখ্য ভেষজ উদ্ভিদ আমাদের আশপাশেই রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশে প্রায় পাঁচশত প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ আছে। এর মধ্যে অর্জুন, কালমেঘ, তুলসী, থানকুনি, বাসক, নিম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫

১। স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করে কোনটি?
ক. অর্জুন খ. আশশ্যাওড়া
গ. তুলসী ঘ. ব্রাহ্মী

২। কোথায় সার্পেনটিন অ্যালকালয়েড আছে?
ক. সর্পগন্ধার মূলে খ. বাসকের পাতায়
গ. গুলঞ্চের কান্ডে ঘ. নিমের ফুলে

৩। কোথায় অ্যাট্রোপিন আছে?
ক. ধুতুরায় খ. আপাং-এ
গ. কালমেঘ-এ ঘ. ছাতিম-এ

৪। শোথ রোগের ভাল ওষুধ কোনটি?
ক. বাসক খ. নিম
গ. নিসিন্দা ঘ. পুনর্নভা

৫। হৃদরোগের ভাল ওষুধ কোনটি?
ক. অর্জুন খ. কালমেঘ
গ. নিসিন্দা ঘ. ছাতিম

৬। উত্তম লিভার টনিক কোনটি?
ক. তুলসী খ. নিম
গ. কালমেঘ ঘ. থানকুনি

৭। কোনটি উচ্চ রক্তচাপ কমায়?
ক. সর্পগন্ধা খ. নিসিন্দা
গ. অশ্বগন্ধা ঘ. গন্ধভেদুলী

৮। বাংলাদেশে কয়টি ভেষজ উদ্ভিদ আছে?
ক. একশত খ. পাঁচশত
গ. অর্ধশত ঘ. শত শত

পাঠ- ৬ ঃ বাংলাদেশে ফুলের চাষ

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- বিভিন্ন জাতের ফুলের সাধারণ নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম লিখতে পারবেন।
- ফুল চাষে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের নাম বলতে পারবেন।
- গোলাপের কয়েকটি জাতের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।

ফুল মহান আল্লাহ্‌র এক পবিত্রতম দান এবং এক মহান সৃষ্টি। ফুল আমাদেরকে দান করে স্নিগ্ধ ভালবাসা, নির্মল আনন্দ, মনকে দেয় স্বর্গীয় শান্তি। ফুল মনের ক্ষুধা মিটায়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেছেন, "যদি তোমার হাতে একটি পয়সা আসে তা দিয়ে ক্ষুধার খাদ্য কিনে নিও, আর যদি দু'টি পয়সা আসে তার অর্ধেক দিয়ে ফুল কিনে নিও।"

বাংলাদেশে ফুলের কোন বানিজ্যিক কদর ছিল না। ভালবাসার প্রতীক হিসেবে আদান প্রদান হতো, কিন্তু বর্তমানে ফুলের বাণিজ্যিক ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়েছে। ঢাকা শহরসহ দেশের প্রায় সব বড় বড় শহরে ফুলের দোকান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিক্রিও হচ্ছে বেশ। ফুলের এই চাহিদা ও কদরের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত সীমিত আকারে হলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলাদেশে ফুলের চাষ শুরু হয়েছে। গড়ে উঠেছে ফুলের নার্সারি, বিক্রি হচ্ছে ফুল, ফুলের মালা, ফুলের চারা। যশোরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিত উপায়ে রজনীগন্ধার চাষ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে রজনীগন্ধা, গোলাপ, গ্ল্যাডিওলা, গাঁদা ইত্যাদি ফুলের চাহিদা বেশ বেড়েছে। এর মধ্যে রজনীগন্ধা ও গোলাপের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এখানে রজনীগন্ধা ও গোলাপের চাষ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

গোলাপ ঃ গোলাপ হলো ফুলের রানী। গোলাপের গণ নাম হলো *Rosa* গোত্র- Rosaceae. পৃথিবীতে গোলাপের অনেক প্রজাতি আছে। বাংলাদেশে যে বুনো গোলাপ জন্মে তা হলো *Rosa involucrata,* এটি সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায় জন্মে থাকে। বিভিন্ন বাগানে যে গোলাপের চাষ হয় তার অধিকাংশই শংকর জাত। কিছু প্রাচীন গোলাপের মধ্যে R.gallica, R.chinensis, R. moschata, R.damascena, R.centifolia ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। R.damascena গোলাপের পাপড়ি থেকে আতর তৈরি (বাষ্প পাতনের মাধ্যমে) করা হয়। বর্তমানে চাষকৃত শংকর জাতগুলোর মধ্যে হাইব্রিড- টি, ফ্লোরিবান্ডা, মিনিয়েচার, হাইব্রিড পারপিচুয়েল, টিরোজ ইত্যাদি প্রধান।

মাটি ঃ গোলাপ চাষের জন্য দোআঁশ মাটি প্রয়োজন। মাটির P^H হতে হবে ৫.৫-৭.৫ পর্যন্ত। মাটির P^H কম হলো চুন মিশিয়ে অথবা P^H বেশি হলে এমোনিয়াম সালফেট বা এমোনিয়াম ফসফেট মিশিয়ে সঠিক মাত্রায় আনা সম্ভব।

জায়গা নির্বাচন ঃ গোলাপ বাগানের জন্য খোলামেলা রৌদ্রময় উঁচু জায়গার দরকার। ছায়ামুক্ত স্থানে বা স্যাঁতসেঁতে স্থানে গোলাপ ভাল হয় না। বাগানে গাছ লাগানোর ২/৩ সপ্তাহ আগে বেড তৈরি করতে হবে। মাটি ভাল মত ঝুর ঝুরে করে নিতে হবে। মাটির সাথে পরিমানমত পচা গোবর সার, সবুজ সার, খৈল ও সামান্য পরিমান ইউরিয়া ও পটাশ মিশিয়ে মাটিকে গোলাপ চাষের উপযোগী উর্বর করতে হবে। মাটিতে বা গাছের গোড়ায় কখনই তাজা গোবর বা তাজা খৈল দিতে নাই। এতে গাছের ক্ষতি হতে পারে।

চারা এনে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ অথবা অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে বেডে চারা লাগাতে হবে। প্রথম দিকে গাছকে কড়া রৌদ্র থেকে রক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। পরে সময় সময় প্রয়োজন অনুযায়ী আগাছা উঠিয়ে মাটি নরম করতে হবে এবং সামান্য সার প্রয়োগ করতে হবে। পূরাতন গাছে শরতে অঙ্গ ছাটাই করতে হবে। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে গাছে ফুল ফোটবে।

টবে গাছ লাগানো ঃ অনেকেই ২/১ টি গোলাপ গাছ টবে লাগিয়ে থাকেন। প্রথমেই টবকে গাছ লাগানোর উপযোগী করে তৈরি করতে হবে, অর্থাৎ টবের নিচে ছিদ্র না থাকলে একটি অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্র করতে হবে। ছিদ্রের উপর একটি ঝামা বা মাটির পাত্রের ভাংগা টুকরো দিতে হবে। এর উপর কিছু পরিমান মোটা বালি দিতে হবে। পরের অংশ দোঁআশ মাটি, পচা গোবর, সবুজ সার, কিছু পরিমান খৈল এবং সামান্য পটাশ ইত্যাদির মিশ্রণ দিয়ে ভরতে হবে। এর কিছুদিন পর টবে গোলাপ গাছ লাগাতে হবে। প্রয়োজনীয় পানি দিতে হবে এবং ১/২ মাস পরপর সামান্য সার প্রয়োগ করতে হবে। গোড়াতে জংলী ডাল বের হলে কেটে দিতে হবে। গাছ পুরাতন হলে টবের মাটি পরিবর্তন করে দিতে হবে।

রজনী গন্ধা ঃ বৈজ্ঞানিক নাম *Polianthes tuberosa,* গোত্র- Amaryllidaceae. বাংলাদেশের জনপ্রিয় ফুল গুলোর মধ্যে রজনীগন্ধা অন্যতম। এর সিঙ্গল, ডবল এবং ভ্যারিগেটেড এই তিনটিই প্রধান জাত। সিঙ্গল-এর গন্ধ ভাল।

এর বালব কান্ড সংগ্রহ করে মে-জুন মাসে বেডে লাগাতে হবে। বেলে দোআঁশ মাটিতে রজনীগন্ধা ভাল হয়। তাই চাষের জন্য ঐ রকম মাটি যুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে। মাটি ঝুর ঝুর করে তার সাথে পচা গোবরসার, খৈল এবং সামান্য পরিমান ফসফেট সার মিশাতে হবে। বাল্‌ব লাগানোর অন্তত: এক সপ্তাহ আগে মাটি প্রস্তুত করতে হবে। বাল্‌ব সারি করে লাগাতে হবে। লাগানোর পর প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

বর্ষাকালে ফুল ফোটবে। রজনীগন্ধার ফুল লম্বা স্ক্যাপ জাতীয় দন্ডে হয়।

বাংলাদেশের ফুল চাষে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের ভূমিকা ঃ বাংলাদেশে ফুল চাষে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগন অনন্যভূমিকা রাখতে পারেন। কারণ, এক্ষেত্রে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের করনীয়ই অধিক। তাঁরা নিম্নলিখিত উপায়ে ফুল চাষে ভূমিকা রাখতে পারেন।

১। ফুল চাষী এবং ফুল ব্যবসায়ীদের জানা দরকার ফুলের সঠিক পরিচয়। প্রতিটি ফুলের সঠিক স্থানীয় নাম, ব্যবসায়িক নাম এবং বৈজ্ঞানিক নাম জানিয়ে দেয়া উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের কাজ।

২। ফুলের সৌন্দর্য ও মূল্য বাড়ে তার সৌন্দর্য ও গন্ধে। সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য একচক্রীয় পাপড়িকে বাড়িয়ে ডবল বা ট্রিপল চক্রীয় করা হয়। সাধারণত: কৃত্রিম শংকরায়নের মাধ্যমে এটা করা হয়। এটি উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের কাজ।

৩। ব্যবসায়িক দিক ও চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রতিটি প্রজাতির সঠিক প্রকরণটি নির্বাচন করা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের কাজ।

৪। প্রতিটি উদ্ভিদই বিভিন্ন রোগ বালাই দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে। এতে ফুলের সৌন্দর্য, গন্ধ ও আকার-আকৃতিও বিনষ্ট হয়, এমন কি ফুল ফোটাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগন রোগ বালাই প্রতিরোধক্ষম প্রকরণ উদ্ভাবন করতে পারেন, আবার রোগাক্রান্ত উদ্ভিদকে সঠিক ওষুধ প্রয়োগ ও সুনির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করে রোগ মুক্ত করতে পারেন।

৫। টিস্যু কালচার ল্যাব-এ অল্প সময়ে সমমানের অসংখ্য চারা তৈরি করে দিয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণ বাংলাদেশে ফুল চাষে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারেন।

৬। সবচেয়ে আকর্ষনীয় ফুল হচ্ছে অর্কিড। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুদর্শন অর্কিড প্রজাতি সংগ্রহ করে এবং টিস্যু কালচার -এর মাধ্যমে দ্রুত বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেও ফুল চাষে, এমনকি ফুল রপ্তানীতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন বাংলাদেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগন।

বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফুল

ক) লিলি জাতীয়

১. রজনীগন্ধা *Polianthes tuberosa* (Amaryllidaceae)
২. সুখ দর্শন *Crinum latifolia* (Amaryllidaceae)
৩. বড় বগনুর *Crinum asiaticum* (Amaryllidaceae)
৪. দোলন চাঁপা *Hedychium coronarium* (Zingiberaceae)
৫. ডে লিলি *Hemerocallis fulva* (Liliaceae)
৬. গ্লাডিওলাস

খ) ঝোপ জাতীয়

১. বেলী *Jasminum sambac* (Oleaceae)
২. যুঁই *J.auriculata* (Oleaceae)
৩. চামেলী *J.grandiflorum* (Oleaceae)
৪. গন্ধরাজ *Gardenia jasminodes* (Rubiaceae)
৫. রঙ্গন *Ixora coccinea* (Rubiaceae)
৬. হাসনাহেনা *Cestrum nocturnum* (Solanaceae)
৭. কাঁঠালী চাপা *Artabotrys odoratissimus* (Anonaceae)

৮. জবা *Hibiscus rosa-sinensis* (Malvaceae)
৯. গোলাপ

গ) বৃক্ষ জাতীয়

১. স্বর্ন চাপা *Mechelia champaca* (Magnoliaceae)
২. বকুল *Mimusops elengi* (Sapotaceae)
৩. কদম *Anthocephalus chinensis* (Rubiaceae)
৪. পলাশ *Butea monosperma* (Fabaceae)
৫. অশোক *Saraca asoca* (Fabaceae)
৬. কৃষ্ণচূড়া *Delonix regia* (Fabaceae)
৭. কাঠ গোলাপ *Plumeria acutifolia* (Apocynaceae)
৮. করবী *Nerium odorum* (Apocynaceae)

ঘ) জলজ

১. শাপলা *Nymphaea nouchali* (Nymphaeaceae) আমাদের জাতীয় ফুল (এর উদ্ভিদতাত্বিক নাম নিয়ে বিতর্ক আছে)।
২. পদ্ম *Nelumbo nucifera* (Nymphaeaceae)
৩. নীলকমল *Nymphaea stellata* (Nymphaeaceae)
৪. আমাজান লিলি *Victoria amazonica* (Nymphaeaceae)

ঙ) অর্কিড

১. *Dendrobium aphyllum*
২. *Cymbidium aloifolium*
৩. *Aerides odorata*
৪. *Rhyncostylis retusa*
৫. *Vanda teres*
৬. *Eulophia geniculata*

চ) শীতকালনি মৌশুমী ফুল

১. অ্যাস্টার *Aster laevis*
২. কসমস *Cosmos bipinnata*
৩. ক্যালেন্ডুলা *Calendula officinalis*
৪. গাঁদা *Tagetes patula*
৫. চন্দ্রমল্লিকা *Chrysanthamum coronarium*
৬. ডালিয়া *Dahlia hybrida*
৭. সূর্যমুখী *Helianthus annuus*

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশে ফুলের বানিজ্যিক কদর সবচেয়ে বেশি হলো গোলাপ এবং রজনীগন্ধার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬

১। নিচের কোনটি বুনো গোলাপ?

ক. *Rosa involucrata* খ. *Rosa gallica*

গ. *Rosa chinensis* ঘ. *Rosa moschata*

২। গোলাপ চাষের জন্য মাটির P^H কত হওয়া প্রয়োজন।
ক. ৩-৫ খ. ৫.৫-৭.৫
গ. ৪.৫-৬.৫ ঘ. ৫.৫-৮.৫

৩। রজনীগন্ধার বৈজ্ঞানিক নাম কোনটি?
ক. *Rosa gallica* খ. *Ixora coccinea*
গ. *Polianthes tuberosa* ঘ. *Mimusops elengi*

৪। Rhyncostylis কোন ধরনের ফুল?
ক. অর্কিড জাতীয় খ. লিলি জাতীয়
গ. জলজ ঘ. ঝোপ জাতীয়

৫। কৃষ্ণচূড়ার বৈজ্ঞানিক নাম কি?
ক. *Butea monosperma* খ. *Saraca asoca*
গ. *Delonix regia* ঘ. *Nerium odorum*

৬। স্বর্ন চাঁপা কোন জাতীয় ফুল।
ক. লিলি খ. মৌসুমী
গ. জলজ ঘ. বৃক্ষ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. খাদ্যশস্য বলতে কি বুঝায়, ব্যাখ্যা করুন।
২. ইরি ও বিরি কি ব্যাখ্যা করুন।
৩. ডালকে গরীবের মাংস বলা হয় কেন?
৪. ল্যাথাইরিজম কেন হয়?
৫. শাক, সবজি ও সালাদ -এর পার্থক্য কি?
৬. ৫ টি ফল সবজির নাম লিখুন।
৭. চা চাষের সুবিধাজনক পরিবেশ লিখুন।
৮. আমাদের জাতীয় ফলের বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র লিখুন।
৯. সেগুন কাঠ কেন আম কাঠ হতে উত্তম, লিখুন।
১০. কাঠের উপাদান গুলোর নাম লিখুন।
১১. বাস্ট তন্তু ও সার্ফেস তন্তু কি?
১২. সাদা পাট ও তোষা পাটের পার্থক্য কি?
১৩. নিম গাছের বৈজ্ঞানিক নাম ও ব্যবহার লিখুন।
১৪. সর্দি-কাশিতে ব্যবহার হয় এমন দু'টি গাছের নাম লিখুন।
১৫. লিলি জাতীয় পাঁচটি ফুলের নাম লিখুন।
১৬. বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের নাম ও এর বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন।

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের ৩টি খাদ্য দানা প্রদানকারি উদ্ভিদের উপর বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. পাঁচটি ডাল প্রদানকারি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, বীজে আমিষের পরিমান এবং ব্যবহার লিখুন।
৩. বাংলাদেশে চাষকৃত তৈলবীজ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৪. দশটি সবজি প্রদানকারি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, ব্যবহৃত অংশ এবং ব্যবহার লিখুন।
৫. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ফল গুলোর নাম লিখুন।

৬. পানীয় বলতে বি বুঝায়? বাংলাদেশে উৎপাদিত পানীয় সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৭. বাংলাদেশের দশটি কাঠ প্রদানকারি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, কাঠের প্রকৃতি ও ব্যবহার লিখুন।
৮. তন্তু কি? উদাহরণসহ ব্যবহার অনুযায়ী এবং উৎপত্তি অনুযায়ী তন্তুর শ্রেণীবিন্যাস করুন।
৯. যে কোন দশটি ভেষজ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, ব্যবহৃত অংশ ও ব্যবহার লিখুন।
১০. গোলাপ ও রজনী গন্ধার চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

	প্র.১	প্র.২	প্র.৩	প্র.৪	প্র.৫	প্র.৬	প্র.৭	প্র.৮
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১ ঃ	ঘ	ক	ঘ	গ	গ	খ	-	-
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২ ঃ	ক	গ	গ	ক	খ	ক	ঘ	ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩ ঃ	খ	গ	খ	ক	ক	গ	-	-
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪ ঃ	গ	খ	ক	গ	ক	গ	-	-
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫ ঃ	ঘ	ক	ক	ঘ	ক	গ	ক	খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬ ঃ	ক	খ	গ	ক	গ	ঘ	-	-